কাব্যগ্রন্থ

বাংলা চার অক্ষর

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

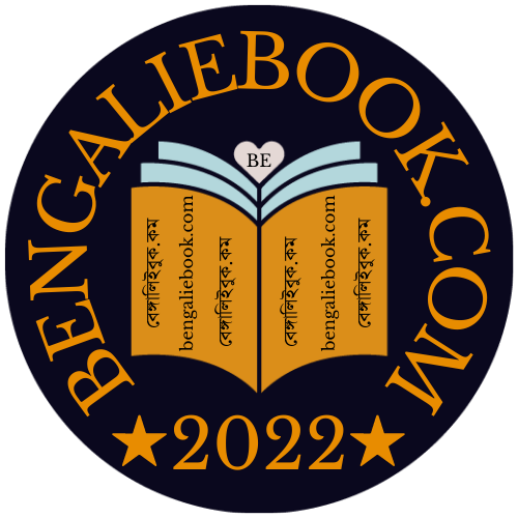

সূচিপত্র

অ-প্রেম.....4
অন্য জীবন.....4
অর্ধরতি.....5
অলীক দেখা.....6
আগমনী কান্না.....7
আচমকা চোখে জল.....8
আমার বয়েস বাড়ছে.....9
এক জন্মের অভিমান.....10
এক পলক.....11
একটি গানের খসড়া.....12
একটু দাঁড়াও.....14
কথা দেওয়া আছে.....15
কবির উপহার.....16
কলম অসহায়.....17
কল্পান্তের আগে.....18

কুমারী মেয়েরা, কবিতা পড়ো না..... ১৯
কুসুমের গল্প..... ২০
কুয়াশার মায়াপাশ..... ২৩
কে তুমি? কে তুমি?..... ২৩
গল্প..... ২৭
জীবনের আত্মজীবনী..... ২৯
জয়জয়ন্তী..... ৩০
তবু একটা গভীর অরণ্য..... ৩১
তুচ্ছ ছন্দ মিলে..... ৩২
তুমুনিতে সেই রাত্রি..... ৩৩
দরজার কাছে এসে..... ৩৪
দেশ-কাল-মানুষ..... ৩৫
ধ্যান ভঙ্গ..... ৩৮
প্রকৃতির প্রতিশোধ..... ৪০
প্রথম দেখার মতো..... ৪২
বহুরূপীর গীতা..... ৪২
বাংলা চার অক্ষর..... ৪৫
বাজের শব্দ..... ৪৬

ভুল বোঝাবুঝি 47
মানুষ হারিয়ে যায় 48
মেঘমল্লার 48
রাধা 49
রাশি রাশি শুকনো পাতা 50
রিঙ্কু-রঞ্জনের বাড়ির কোলাজ 51
সম্বোধনে মরীচিকা 52
সিঁড়িতে কে বসে আছে 55
সীতার অগ্নিপরীক্ষা 55
সুন্দরের স্বপ্ন ভাঙে 57
স্বপ্ন 58
হাওয়ায় উড়ছে 59
হিমালয়কেও দেখা যায় না 61
হে রাত্রি, পাথর-ভাঙা 61

অ-প্রেম

ভালোবাসা ছিন্ন করে চলে যাওয়া তেমন শক্ত না
অনেকেই যায়, তারা কোন দিকে যায়, নিরুদ্দেশে?
রক্ত সাগরের তীরে জাহাজ অপেক্ষমাণ, অথবা রক্ত না
কালো হ্রদ, দুর্নিবার মেঘ ঝঞা দিগন্তের শেষে।

বুকের ভেতরে মেঘ, যার অন্য নাম অভিমান
পায়ের তলায় ফুল, কিংবা পিঁপড়ে দলে পিষে যাওয়া
ভালোবাসা তাও নয়, আরও পলকা, একটি ফুৎকারে খান খান
মরুভূমি জেগে থাকে, শিয়রে সশস্ত্র ঘোরে হাওয়া।

অন্য জীবন

বাইরে যখন ফর্সা আকাশ, মাথায় গোলকধাঁধা
অসীম যখন উদ্ভাসিত, তখন চক্ষু বাঁধা!

এসব হল ভাবের কথা, অভাব চতুর্দিকে
শরীর ভরা আগুন জ্বলে খিদেতে ধিকধিকে।

রাস্তাগুলো দিক ভুলে যায়, দুপুরে মরীচিকা
অন্ধকারে কোথাও নেই একটা কোনো শিখা?

এ জীবনের একদিকে প্রেম, অন্যদিকে অন্ন
ভাতের থালায় নুন পড়েনি, প্রেমও মতিচ্ছন্ন!

সকালবেলা মন যদি দাও বিশ্ব বিসম্বাদে
পৃষ্ঠা জুড়ে রক্তারক্তি, লক্ষ শিশু কাঁদে।

তবুও বেঁচে থাকার মধ্যে বিদ্যুতের ঝলক
ঝলসে ওঠে অন্য জীবন, দু' চোখ নিষ্পলক।

অর্ধরতি

পায়ে চলা পথ, ঝিরিঝিরি এক নদী
মেঘের খেলায় এই আলো, এই ছায়া
ওপারে দাঁড়িয়ে যারা দেয় হাতছানি
জানি তারা সব ছদ্মবেশিনী মায়া।

স্বচ্ছ সলিল, বালিতে স্বর্ণকণা
হাঁটু গেড়ে বসি, করতলে আচমন
যে-মুখের ছবি হারিয়ে গিয়েছে কবে
জাদু আয়নায় দেখা যায় যৌবন।

মন্দ কী, হোক নদীটি মন্দাকিনী
অর্ধরতির বাকি অংশটি আজ
শেষ আশ্লেষে এখানেই হোক সারা
খুলে ফেলে সব অহঙ্কারের সাজ।

মায়া সশরীর, ঘূর্ণি হাওয়ার নাচ
নদী তোলপাড়, কালিমালিপ্ত বেলা
হে পথিক, তুমি ভুলে গেছ সব শ্লোক
মৎস্যগন্ধা বেয়ে চলে যায় ভেলা।

অলীক দেখা

ঝড়ের যেমন একটা চোখ থাকে তেমনি নদীরও থাকে
দুটো ডানা
পাহাড় মাঝে মাঝে মাথা নিচু করে
এক দেশ সরে যায় অন্য সমুদ্রের দিকে
মরুভূমি লকলকে জিভ দিয়ে চাটে মেঘ
নারীরা মিহিন বাতাসে মিশে অদৃশ্য হয়ে যায়
এক একদিন রাত্তিরের ঝিমঝিমে অন্ধকারে বসে থেকে দেখেছি
পাথরের গায়ে ছেনি দিয়ে লেখা হচ্ছে ইতিহাস।

অকস্মাৎ শোনা যায় ছুটন্ত নক্ষত্রগুলির গগনভেদী শব্দ
বিশ্ব-নিখিলের ঐকতানে একটু একটু করে লাগছে রং
বইয়ের পৃষ্ঠায় দীর্ঘশ্বাস ফেলছে অতৃপ্ত মৃত লেখকরা
একটা পোড়ো, ভাঙা বাড়ির সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে
অতি বৃদ্ধ, বিস্মৃত রাজমিস্তিরি
দেওয়ালের বাঁধানো ছবি ঝড়কে ডাকছে, এসো, এসো
একদিন রাত্তিরের ঝিমঝিমে অন্ধকারে বসে থেকে দেখেছি
জোনাকিগুলি উড়ে উড়ে রচনা করছে
আমারই ব্যর্থতার ছবি
কে যেন ডাকছে, এমন অজানাতম দুঃখী কণ্ঠস্বরে?

আগমনী কান্না

সভ্যতার সঙ্কটের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ মনে হয়
রবীন্দ্রনাথ যদি আজ বেঁচে থাকতেন
অমনি শুনতে পাই দীর্ঘশ্বাসের শব্দ
শেষ রাতে স্বপ্ন দেখি পিকাসোকে
আবার গের্নিকা আঁকছেন
ঘুম ভাঙার পরও ঘোর কাটে না
দেয়ালে লেনিনের ছবির চোখ দুটো মনে হয় জীবন্ত
যেন কিছু বলতে চাইছেন তিনি
জানলার বাইরের উন্মত্ত চিৎকারে কি মাথা খারাপ
হয়ে যাচ্ছে আমার;
ওঁরা তো কেউ নেই, অনেক দিন নেই
চলে গেছেন বার্ট্রান্ড রাসেল ও গান্ধীজি
চার্লি চ্যাপলিন নেই, চলে গেছেন সত্যজিৎ রায়
পল রবসন, বড়ে গুলাম আলি খান
মাদার টেরিজা আর মার্টিন লুথার কিং
যাঁদেরই কথা মনে পড়ে, সবাইকে খেয়ে নিয়েছে
বিংশ শতাব্দী
তা হলে এই নতুন শতাব্দীতে সুস্থতার ভরসা চাইব
কার কাছে?
পরের মুহূর্তেই শুনতে পাই
সদ্য জন্মানো পঞ্চান্ন হাজার শিশুর আগমনী কান্না...

আচমকা চোখে জল

একদিন যারা খুব কাছাকাছি ছিল, এখন তারা অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে
কেউ কেউ অদৃশ্যলোকে
এটা নতুন কিছু নয়
কোনো সময়ে সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রগুলোও তো জড়ামড়ি করেছিল
একান্নবর্তী পরিবারের ভাইবোনদের মতন
তারপর আত্মীয় বন্ধুদের মধ্যে যেমন হয়, একটু একটু ব্যবধান
তারপর তাদেরও আলাদা আলাদা বৃত্ত
কয়েক ঋতুর অদেখা, ক্রমশ আলোকবর্ষ
এখন গোটা মহাবিশ্বই বেলুনের মতো ফুলছে
অস্তিত্বগুলো পালাচ্ছে যে যেদিকে পারে
কেউ কারুর দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না
মুছে ফেলছে পূর্বস্মৃতি, পিছুটান নেই, এমনকী
রেয়াত করছে না মাধ্যাকর্ষণও
একদিন এই বেলুনটা হঠাৎ ফেটে গিয়ে সবাই ডুবে যাবে
মহাকাল সাগরে
এই ধাবমানতাই ডেকে আনবে অন্তিম পরিণতি
আমার প্রতিটি পরমাণুতে বহন করছি
সেই দূরত্ব সৃষ্টির বিশ্ব ইতিহাস...
হে মহাকালের প্রবাহ, তোমাকে দেখতে পাই না
তবু কেন আচমকা চোখে জল এসে যায়
এক একটা অশ্রুবিন্দু নিজেই জিভ দিয়ে চাটি!

আমার বয়েস বাড়ছে

ছোট ঘোট আয়নাগুলো দূরে সরে যাচ্ছে
আমার বয়েস বাড়ছে, আয়নাদেরও বয়েস বাড়ে না?
ভাঙা কাচ দেখে মনে পড়ে
এই কি সেই মুখচ্ছবি?
যেন জল ভেঙে যাওয়া
জলের অতলে খুব নিঃশব্দে ডুবে যায় মুখআ।
মার জলের কাব্য সব মিথ্যে
মুখখানি বুকে বিঁধে আছে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে থেমে যাই
কেউ নেমে আসছে হুড়মুড়িয়ে
শপশপ শাড়ির শব্দ, বনবিড়ালীর মতো অন্ধকারে
জ্বলে-ওঠা চোখ
কয়েকটি মুহূর্ত যেন অনন্ত, যেন সব কিছু স্থির
কে যে কাকে দেখে, কেউ চেনার পলক থেকে
অচেনা জগতে চলে যায়
আমার সিঁড়ির কাব্য সব মিথ্যে,
মুখখানি বুকে বিঁধে আছে।

আমার বয়েস বাড়ছে
নীদের বয়েসের গাছ পাথর নেই
আমার তারুণ্যে দেখা তন্বী নদীগুলি সব
ফলগু হয়ে গেল?

নগর ছড়ায়, মরুভূমিও ছড়ায়
শুধু আদিম অরণ্য কুঁকড়ে মুকড়ে যাচ্ছে সরে
শিমুল গাছের নীচে পা ছড়িয়ে বসে কেউ
বাঁশি বাজাবে না?
কোমরের ভাঁজে কলসি, লেপ্টে থাকা ভিজে শাড়ি
ঊরুতে বিদ্যুৎ
আমার বয়েস বাড়ছে, সে কি আরও আগে চলে গেল
আমার সময় কাব্য সব মিথ্যে, মুখখানি বুকে বিঁধে আছে।

এক জন্মের অভিমান

দেখতে দেখতে জানতে জানতে ভাঙতে ভাঙতে যাওয়া
পৃথিবীর মতো মহাশূন্যেও কত অনন্ত বৃত্ত
জীবনটা শুধু একমুখী, তার পেছনে চক্ষু নেই
কোথাও একটু বিরতিও নেই, দু-এক কদমও কেউ কোনওদিন ফেরেনি
সিঁড়িতে একলা বসে থাকা, চোখ হতবাক, পটভূমিতে অন্ধকার
বসে থাকাটাও থেমে থাকা নয়, আয়ুতে ঘড়ির কাঁটা।

বৃষ্টির ফোঁটা ফিরে ফিরে যায়, নদীও কিছুটা ফেরে
ঝড়-বিদ্যুৎ, বাজ গর্জন, মাটিতে শীত বসন্ত
শুধু প্রাণ, যার এত দাপাদাপি, সে মিশে যাবেই ধুলোয়
সময় এমনই হিংস্র যে তাকে কামড়ে চিবিয়ে কুলকুচি করে হাওয়া
মরীচিকা, নাকি দূরের আলেয়া, টেনে নিয়ে যায় এক দিগন্তপ্রান্তে
অসম যুদ্ধ, মানুষের কোনও হাতিয়ার নেই সেই পড়ন্ত বেলায়!

চোখ ভরে দেখা, চোখের আলোও ছায়া ছায়া হয়ে আসে

এত জানাজানি, এত কিছু শোনা, শুধুই ভ্রমের শ্রম?
অর্ধেকও কাজে লাগে না জীবনে, হঠাৎ কখন বিস্মরণের হানা
সব সাধ, সব ভালোবাসাবাসি অপূর্ণ থাকে, মাঝপথে যবনিকা
অসহায় রাগে খাক হয় মন, জলে ধুয়ে যায় ছবি
এই চলে যাওয়া, সকলেই যায়, বুক ভরা এক জন্মের অভিমান!

এক পলক

যেই এক পলক ফেললাম, দৃশ্য বদলে গেল
রোদ ঝলকাচ্ছিল না? এখন মৃদু চুম্বনের শব্দে বৃষ্টি পড়ছে
সেই বৃষ্টির রং একটি কিশোরীর ঘুমভাঙা চোখের মতন
যে-রাস্তায় ছজন লোক হল্লা করছিল, এখন সেখানে
শুধু এক অন্ধ ভিখিরি
পেয়ারা গাছের ডালটায় তিনটে ছাতারে পাখি নেই,
একটি মাত্র ফড়িং
বদলে যায়, এক পলকে অনেক কিছু বদলে যায়
বিনতা মাসি হাঁটু গেড়ে চোখ বুজে বসে আছেন, আগে তাঁর চোখে
চশমা ছিল না
রশিদ খান হারিয়ে গিয়েছিল, মশমশিয়ে হেঁটে আসছে রশিদ
পাশের তালাবন্ধ বাড়িটায় কেউ গলা সাধছে
মাঠের মধ্যে ফাঁকা মঞ্চ, মুখ্যমন্ত্রী সাপ-লুডো খেলছেন
তাঁর মেয়ের সঙ্গে
একটা ঘুড়ি দুলতে দুলতে গোঁত খেয়ে পড়ল পুকুরে
গেরুয়া পরা ছোট মামা মাথার চুলের মুঠি ধরে কাঁদছেন
ইস্কুলের ঘণ্টা হঠাৎ বেজে উঠল আজ ছুটির দিনে

একটু জিরিয়ে নেবার জন্য চেতন মিস্তিরি বাজাচ্ছে বাঁশি
ব্রিজের ঠিক মাঝখানে গম্বুজের মতন দাঁড়িয়ে আছে নিষ্পলক শেখ সুলেমান
সুনীল গাঙ্গুলির কলমের ডগায় প্রেমের কবিতার বদলে মৃত্যুভাবনা
চেনা মাছওয়ালা ঢোল বাজিয়ে মেতে উঠেছে হরি সংকীর্তনে
বারান্দা থেকে ঝুঁকে আছে যে-মেয়েটি, তাকে ঝাপটা দিয়ে গেল
পলাশ রঙের আলো
বদলে যায়, এক পলকে অনেক কিছু বদলে যায়
কৃষ্ণচূড়া পাতার আড়ালে একটা কোকিল শুধু ডেকেই চলেছে
কেউ সাড়া দেয় না, তবু সে ডাকে।

একটি গানের খসড়া

আর দূরে নেই স্বর্গরাজ্য, হ্যাঁচ্চো!

এমন সাধের বিকেলটা আজ
রাজা পরেছেন কোটালের সাজ
ধরে আন আছে যত ধড়িবাজ
হ্যাঁচ্চো!

দিকে দিকে আজ কত প্রকল্প
প্র-পূর্বক কল্প গল্প
আমি বেশি নেব, তুমিও অল্প
হ্যাঁচ্চো!

শোনো শোনো আজ উলট পুরাণ
সেতুবন্ধনে সীতা ঘুষ খান

রাবণকে দেখে রাম পিঠটান
হ্যাঁচ্চো!

নন্দ ঘোষেরা থাকেন দিল্লি
নাকি সুরে গায় আদুরে বিল্লি
শুনে শুনে ফাটে কানের ঝিল্লি
হ্যাঁচ্চো!

দিল্লির খুড়ো-খুড়িরা ব্যস্ত
পদী-পিসিমার চরণে ন্যস্ত
পদী পিসি খান মুন্ডু আস্ত
হ্যাঁচ্চো!

সকলেই আজ তাসের খেলুড়ি
ইস্কাবনের বিবি থুরি থুরি
যে-যেমন পারো ছুঁয়ে থাকো বুড়ি
হ্যাঁচ্চো!

আরও খেলা আছে চোর ও পুলিশ
তুমি পুঁটি খাও, আমার ইলিশ
তুমি বাংলায়, আমি ইংলিশ
হ্যাঁচ্চো!
(হ্যাঁচ্চো, হ্যাঁচ্চো, হ্যাঁচ্চো, দূর ছাই, এ কী সর্দি হল রে বাবা, রুমালটাই বা কোথায় যে গেল!)

রুমালটা ছিল কোথায় যে গেল
আমার পকেটে কে হাত ঢোকাল
কিল খেয়ে তবু চুপ থাকা ভালো

হ্যাঁচ্চো!
আর দূরে নেই স্বর্গরাজ্য
হ্যাঁচ্চো, হ্যাঁচ্চো, হ্যাঁচ্চো।

একটু দাঁড়াও

তুমি যে-ই মাথা নিচু করলে আমি দেখতে
পেলাম তোমার পায়ের পাতা
আমি তোমার স্তনবৃন্ত কখনো দেখিনি
শুধু দেখছি কুয়াশায় অধোলীন তোমার বুকের
অর্ধবৃত্ত
তোমাকে কতবার দেখেছি
কিন্তু আমি তোমার যথার্থ নির্মাণ একবারও দেখিনি
তুমি তোমার তুমিত্ব থেকে যে-ই বেরিয়ে এলে
তার আগে আমি আমার আমিত্বের খোলসে ঢুকে পড়ে
হয়ে গেলাম চৌরাস্তার যাত্রী
এই মুহূর্তে তোমাকে চাই অথচ তোমাকে চিনতেই পারছি না
তুমি আমার পাশে দাঁড়িয়ে আর কার সঙ্গে যেন
চোখাচোখি করলে?
রূপান্ধ যুবার ভ্রান্তি অনিত্যকে নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি করে ফেলে
মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে তুমি নেমে আসছ, পেছনে সব
মন্দির ভেঙে পড়ছে
সমস্ত দেবী মূর্তি তুচ্ছ করে তুমিই শেষ পর্যন্ত একমাত্র...
দেবী নও, কী করুণ ও সাধারণ, হাহাকারময়, ক্ষীণতনু,
এদিক ওদিক তাকাচ্ছ অসহায়ের মতন...

একটু দাড়াও, আমি অনন্তের উজান ঠেলে আসছি
এই তো এসে পড়লাম বলে...

কথা দেওয়া আছে

এখানে ওখানে জ্বলছে আগুন, তবুও তোমার সঙ্গে আমার
দেখা হবে নাকি বকুল গাছের নিরালা ছায়ায়?
সব রাস্তাই বন্ধ, মানুষ ছুটছে শুধুই দিক ভুল করে
বাতাসে ধোঁয়ার বিষের বাষ্প, কিংবা মিথ্যে কথার গন্ধ?

তবুও কি আমি দরজা-জানলা রুদ্ধ রাখব
মরুঝড়ে উট যেমন বালিতে মুখ গুঁজে রাখে
আমিও তেমন, ঝড়ে নামব না?
নদী উত্তাল, আকাশে বারুদ, প্যাঁচা ও বাদুড়
ওড়াউড়ি করে মধ্য দুপুরে
ক্ষুধিত মানুষ ধর্ম খাচ্ছে, মাথায় ও পায়ে ধর্ম মাখছে
ইতিহাস ছিঁড়ে জ্বালছে উনুন, কোথা থেকে এত হাঙর-কুমির
হাসি হাসি মুখে খেলতে এসেছে?

এত বাধা, এত যবনিকা ছিঁড়ে যেতে দেরি হবে
তোমার সঙ্গে দেখা হবে, সেই কথা দেওয়া আছে
বকুল গাছকে
যদিও বা তুমি আগে পৌঁছোও, দেখো যেন সেই
বকুল গাছটা ঝলসে না যায়!

কবির উপহার

ছায়া সিনেমার মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমার অল্প বয়েস
নয় কি এগারো, হাত মুঠো করে চেঁচিয়ে পড়ছি কবিতা
‘বল বীর, চির উন্নত মম শির...’ সামনেই বাবা
ভয়ে উদগ্রীব, যদি ভুল করি, যদি মুখস্থ ফসকায়
আমি নির্ভয়, সেই সভা ঘরে ক্ষুদে আবৃত্তিকার
হাততালি কম পায়নি, এবং একটা রুপোর মেডেল!

বাংলার স্যার একদিন নিয়ে গেলেন কবির কাছে
জন্মদিনের উৎসব, কত ভক্ত এবং ফুলটুল
কবি রয়েছেন নির্বাক, চোখ কারুকেই দেখছে না
প্রণাম করেছি, পিঠে খোঁচা মেরে স্যার বললেন, শোনাও
কবিকে শোনাও সেই কবিতাটা, অন্য অনেক লোকেরা
তারাও বলল, শোনাও ও খোকা, শুরু করো, শুরু করো
কিন্তু আমার গলা থেকে আর বেরুল না কোনো শব্দ
পালাতে পারলে বাঁচি, ভিড় ঠেলে কী করে কোথায় লুকোব
ভয়ে লজ্জায় কুঁকড়ে মুকড়ে আমি যেন অদৃশ্য!

অত গোলমাল, অত স্তবস্তুতি কবির সহ্য হল না
গলার মালাটা একটানে ছিঁড়ে দিলেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে
একখানা ফুল ছিটকে পড়ল আমার বুকের ওপর
চট করে সেটা তুলে নিই কেউ দেখল কি দেখল না

সেই ফুলখানা আজও রাখা আছে আমার খাতার ভাঁজে...

কলম অসহায়

ছায়ার পায়ে পায়ে মানুষ ঘোরে
মানুষ নেই, তবু দেয়ালে ছায়া
কিসের গোলযোগ গলির মোড়ে
কে ছেড়ে যেতে চায় মর্ত্যকায়া!

দুঃখী সংসার জয়নগরে
মেয়েটা কাজ করে ইঁটভাটায়
ছেলেটা মাটি ছেনে মূর্তি গড়ে
দু' বেলা মুড়ি খেয়ে দিন কাটায়।

ইঁটের পর ইট উঁচু প্রাসাদ
সিঁড়ির ধাপে ধাপে পায়ের ছাপ
কে জানে ছিল কার গোপন সাধ
কে হাসে, কে লুকোয় মনস্তাপ?

দোকানখানি ছোট হাটখোলায়
কেন রে সেটা ফেলে মিছিলে যাস?
আগুন লাগে কেন ধানগোলায়
রক্তমাখা পথ, পুকুরে লাশ!

ছোঁয়নি কোনোদিন কাগজ খাতা
কবিতা-কাহিনীর জানে না কিছু
যখনই লিখি আমি তাদের গাথা
কলম অসহায়, মাথাটা নিচু!

কল্পান্তের আগে

কাছাকাছি সব কিছুর মধ্যে হঠাৎ ঢুকে পড়ছে দূরত্ব
দূরত্ব শব্দটাই অনবরত জ্বালাচ্ছে আমাকে
যা-ই লিখতে যাই, কলমের ডগায় পিঁপড়ের মতন দূরত্ব এসে যায়
তবে কি শুরু হয়ে গেল কল্পান্ত?
মাথা তুলছে ডুবো পাহাড়, মেঘের সঙ্গে উড়ে যাচ্ছে
শিকড় সমেত গাছপালা
অতিকায় প্রাণীর মতন সহস্রাব্দ ল্যাজ আছড়াচ্ছে
পাশ ফিরে
এমনও কি হতে পারে, দিন-দুপুরে যা আমার চোখের সামনে জীবন্ত
তা অন্য কেউ দেখছে না?

ময়দানে ঘাস ছিঁড়ে মুখে দিচ্ছে জামার সবকটি বোতাম খোলা ছেলেটি
আর মেয়েটির শাড়ির পাড়ের বাইরে রক্তাভ পায়ের পাতায়
বিন্দু বিন্দু শখের দুঃখ
ওরা অন্য কিছু দেখছে না, ওদের মধ্যেও কি উঁকি মারছে দূরত্ব
নইলে সন্ধে হবার আগেই ও কীসের, পর্বতের মতন দীর্ঘ ছায়া?
তবে কি শুরু হয়ে গেল কল্পান্ত?
নদীরা সব দল বেঁধে ফিরে যাচ্ছে বাপের বাড়িতে
মাথা তুলছে ডুবো পাহাড়, মেঘের সঙ্গে উড়ে যাচ্ছে
শিকড় সমেত গাছপালা
ধানক্ষেতে পড়ে আছে এত গুঁড়ো গুঁড়ো স্বপ্ন...
হঠাৎ শহরটা বিনা যুদ্ধে ব্ল্যাক আউট ঘোষণার মতন
অলীক হয়ে যায়

চোখের নিমেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে এক-একটা রাস্তা
গুলি ভরা পিস্তল নিয়ে যে ছুটছে, তারই পিঠে
লাগছে প্রথম গুলিটা
নিভে যাওয়া বাতিস্তম্ভের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল
চকখড়ির মতন মুখওয়ালা একজন মানুষ
কী অসম্ভব ঠান্ডা চোখে সে খুঁজছে কোনও পাশা খেলার সঙ্গী
মেঘের গুরু গুরু ডাকে শোনা যাচ্ছে সমস্ত নিয়ম ভাঙার আহ্বান
তবে কি শুরু হয়ে গেল কল্পান্ত?

ময়দানে বোতাম খোলা ছেলেটি আর একটু দাঁতে কাটুক ঘাস
মেয়েটির চোখ থাক না কান্নাভেজা, রুমাল ছোঁয়াবার দরকার নেই
আরও কিছুক্ষণ, আরও কিছুক্ষণ
বিশ্ব-সংসার চোখ বুজে থাকো
দূরত্ব, তুমি থমকে দাড়াও!

কুমারী মেয়েরা, কবিতা পড়ো না

কুমারী মেয়েরা, কবিতা পড়ো না, বিপদে পড়বে
যে-বয়সে মেঘ বেশি ডাকে তার আকাশ অন্য
কবিতার বই ভুলেও ছুঁয়ো না, আঙুল পুড়বে
কবিরা নিজেরা স্বেচ্ছায় জ্বলে লেখার জন্য।

সিঁড়ি দিয়ে দুদ্দাড় করে উঠে হঠাৎ দাঁড়িয়ে
কী শুনলে তুমি? কে যেন ডাকছে অচেনা গলায়
কেউ নেই তবু হাওয়াও জড়ায় দু' হাত বাড়িয়ে
মেঘ ভাঙা চাঁদ তোমাকে ভোলায় ছলায় কলায়।

যারা কাছাকাছি, সব বড় চেনা চোখের চাহনি
এক এক সময় স্নেহ তেতো লাগে, দপ করে জ্বলো
যখন যা আসে সব ভুল, তুমি কিছুই চাওনি
বাথরুমে গিয়ে আয়নার ঠোঁটে সব কথা বলো।

কুমারী মেয়েরা, কবিতা পড়ো না, ছুঁয়ো না ও বই
ছেলেরা পড়ুক, চিঠিতে দিক না খাসা উদ্ধৃতি
বুঝে বা না বুঝে বন্ধুরা মিলে করো রৈ রৈ
কোনো একদিন সেই হাসিটাই হয়ে যাবে স্মৃতি।

যে-সব নারীরা আড়ালে, অচেনা নদীর মতন
কবিরা তাদেরই মূর্তি গড়ার ভাষা খুঁজে মরে
তাদের লুকোনো দুঃখে থাকে না ছন্দপতন
নির্মাণ খেলা সারাটা জীবন কালো অক্ষরে।

কুমারী মেয়েরা, বিপদটাকেও আচারের মতো
চেখে নিতে চাও চকিতে একলা দুপুরের দিকে?
চাখে তবে, দায়ী করো না কিন্তু, হও সম্মত
এমন মধুর সর্বনাশের জন্য কবিকে!

কুসুমের গল্প

মাদারিহাটের চা-বাগানের কম্পাউন্ডার বাবুর মেয়ে, তার ডাকনাম কুসুম
চেহারা এমন আহা মরি কিছু নয়
বয়েসের তুলনায় বড়সড়, নাকটা একটু চাপা
শ্রাবণের মেঘের মতন গায়ের রং

তার চোখ দুটিতে পাহাড়ের লুকোনো ঝর্নার চঞ্চলতা
গান জানে না, কবিতা পড়ে না, শুধু কী করে যেন একটা নাচ শিখেছে
ইস্কুলের অ্যানুয়াল ফাংশানে ক্লাস টেনের সেই কুসুম
আর দুটি মেয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নাচতে নাচতে
তালে ভুল করল তিনবার
ফিক করে হেসে ফেলল লজ্জায়
কী আশ্চর্য, তবু উত্তরবঙ্গে বেড়াতে আসা
এই বাগানের মালিকের ছেলের বন্ধু উজ্জ্বল নামে যুবকটি
মুগ্ধ হয়ে গেল তাকে দেখে
নাচ নয়, কুসুমের হাসিটাই বেশি পছন্দ হয়েছিল তার
শুধু কম্পিউটার দক্ষ নয়, সম্প্রতি পিতৃবিয়োগের পর
সে হরিয়ানার একটি কারখানার উত্তরাধিকারী হয়েছে
আপত্তির তো প্রশ্নই ওঠে না, এ যে অভাবনীয় সৌভাগ্য
তিনমাসের মধ্যে বিয়ে, কুসুমকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল
দিল্লির উপান্তে

কলেজে ভর্তি করানো হল কুসুমকে, তার উচ্চারণে
বড় বেশি ভুল
নাচ শিখতে পাঠানো হল সোনাল মানসিং- এর
কাছে সোনাল তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন তিন সপ্তাহ বাদে
তার পায়ে ছন্দ নেই
দেখতে দেখতে কেটে গেল চার বছর
উজ্জ্বল চলে গেল অন্য বাগানের ফুলের দিকে
তারপর পশ্চিম গোলার্ধের স্বর্ণ মরীচিকার হাতছানিতে।
হরিয়ানার কারখানার কোয়ার্টারের দোতলায় থাকে কুসুম
এমনি কোনো অসুবিধে নেই, টিভির বেলায় কাটে সারাদিন

আর প্রায় সর্বক্ষণ আঙুলে চাটে তেঁতুলের আচার
সেইজন্যই সে চিঠি লিখতে পারে না
এক এক রাতে সে উঠে আসে ছাদে
এখানে চা-বাগানের সবুজ ঢেউ নেই
দিগন্তে নেই পাহাড়ের রেখা
শুধু শুকনো ঊষর প্রান্তর, ডাঙা জমি আর কারখানার চিমনি
মাদারিহাট থেকে বোঁটা ছিঁড়ে আনা কুসুম কিছুতেই শুকিয়ে
ঝরে যেতে রাজি নয়
সোনাল মানসিং যাই বলুন, সে এখনো একা একা নাচে
আকাশের নীচে
মাঝে মাঝে একটু আধটু তালভঙ্গ হয় হোক, কেউ তো দেখবে না
স্কুলের ফাংশনে আর যে-দুটি মেয়ে নেচেছিল তারা এখন
কোথায়, কে জানে
তাদের নাম অনসূয়া আর প্রিয়ংবদা নয়
কিন্তু কুসুমের বাবা-মা শখ করে তার ভালো নাম রেখেছিলেন
শকুন্তলা
নিজের তলপেটে হাত রাখে সে আনমনে
টের পায় একটু একটু নড়াচড়া
আসছে, একজন আসছে, সে খেলা করবে সিংহশিশুর সঙ্গে

এখনো অনেক কিছু ঘটবে!

কুয়াশার মায়াপাশ

ঝড় উঠবার আগেই সে কেন হঠাৎ হারিয়ে গেল
নৈরাজ্য বা বিপর্যয়ের জন্য একটু অপেক্ষা করল না
আকাশ যখন মেঘের সঙ্গে মেতে ওঠে সংঘর্ষে
তখন চতুর্দিকেই তো চলে এলোমেলো আনাগোনা।

যারা কাছে ছিল তারা কোন্ টানে চলে গেল খুব দূরে
একা বসে আছি সারাটা বিকেল রোদ ঝলমল ছুটি
কিংবা আমিই জ্যা-মুক্ত এক তিরের মতন বেগে
কিছুই না জেনে বাতাসে রেখেছি ব্যর্থ বজ্রমুঠি!

মায়ের সঙ্গে দেখাও হয় না, বাবার ছবিটি ম্লান
কৈশোর যেন সাদা কালো ছবি, উইধরা অ্যালবাম
সুন্দর, তুমি পাঠালে আমায় অলীক অন্বেষণে
যেখানে যেখানে আঙুলের ছোঁয়া ব্যর্থ মনস্কাম।

কেউ কি হারিয়ে গিয়েছে, অথবা আমিই এখানে নেই
এই যে আকস্মিক সন্ধ্যায় শুরু হয় হা-হুতাশ
ঈষৎ নেশায় মনগড়া সব দুঃখেরা উদ্বেল
সব দুঃখই নদীসঙ্গমে কুয়াশার মায়াপাশ।

কে তুমি? কে তুমি?

সুপর্ণ বেরিয়ে যায় কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ন'টায়

সুপর্ণটা কে?
বাঃ সে একজন বহুরূপী নয়?
নারী সেবা সমিতিতে সকলেই তাকে জানে
মিসেস অলকা বিশ্বাসের হাজব্যান্ড
অগ্রণী তরুণ সঙ্ঘে সম্বিতের বাবা
নন্দিতারও বাপি, তবে সেটা বলে রাস্তার ওপারে
হলদে বাড়ির মাসিরা
অফিসে, পার্টিতে তার ডাকনাম এস বি, কিংবা
‘এস ও বি’-ও বলে কেউ কেউ
গাড়ি আসে সাড়ে নটায়, সদ্যস্নাত সুপর্ণ বিশ্বাস ঠোঁটে
সিগারেট ঝুলিয়ে দরজা খোলে।
তার ফিরতে রাত হবে, দিল্লি থেকে হেড অফিস
উড়ে আসছে সন্ধের বিমানে
এটা আজ ছুতো নয়, অন্যদিন ক্লাব গমনের মতো নয়
অবশ্য সে ভুলে যায় না ছেলে মেয়েদের জন্মদিন।

সম্বিৎ থার্ড ইয়ার, তার আছে কলেজে যাবার
কিংবা না-যাবার পূর্ণ স্বাধীনতা
কোনো কোনোদিন খুব ভোর থেকে সে নিশ্চপ, একাচোরা
বিশ্বসংসারের সঙ্গে কোনো যোগ নেই
আবার কখনও তীব্র নাদে সে বাজায় বহুক্ষণ
বিদ্যুৎ-গিটার
সেদ্ধ ডিম খাবে বলেছিল, পড়ে রইল, সে খেল না
দুই বন্ধু এসে
ডেকে নিয়ে গেল নিরুদ্দেশে।
ছোট মেয়ে নন্দিতাকে সাজিয়ে গুছিয়ে ঠিক তুলে দিতে হয়

পৌনে দশটার স্কুলবাসে
ইদানীং সাজগোজ নিজেই সে করে নেয় বেশ
সদ্য সে চোদ্দোয় পা, তার বালিকাত্ব খসে যাচ্ছে হুড়মুড়িয়ে
বিরলে মায়ের সঙ্গে গোপন কথার দিন শেষ
বাথরুমে ভেজা ফ্রক ও ব্রা ফেলে রাখে
বকুনিতে গ্রাহ্য করে না
অন্যদিকে চেয়ে থাকে, মনে মনে ফুরফুরিয়ে হাসে
স্কুল থেকে ফিরেই সে হলদে বাড়িটায় কেন যায়
মার চেয়ে মাসিদের দরদের এতখানি টান
ও বাড়িতে কারা যেন মড়াকান্নার মতো গান গায়
প্রত্যেক সন্ধ্যায়
এখন নন্দিতা আর মা' যাচ্ছি' বলে না।

তারপর, অলকা বিশ্বাস, তুমি কার?
সুদীর্ঘ দুপুর, সল্ট লেকে ধু-ধু বেলা
কাক-শালিকেরও ছুটি, চিলেরাও ক্রমে ঊর্ধ্বাকাশে
উঠে যায়
রাস্তায় কুকুরগুলো ঘুমের আশ্রয় খোঁজে
সাইকেল রিক্সার নীচে পাতলা ছায়ায়
এ অঞ্চলে ফেরিওয়ালা বিশেষ আসে না
ক্বচিৎ গাড়ির শব্দ স্তব্ধতার তালভঙ্গ করে যায়
বেরসিকভাবে
অলকা বিশ্বাস দরজা বন্ধ করে সিঁড়ি দিয়ে
উঠতে উঠতে থেমে গেল কেন যে সহসা
আঁচল স্খলিত, দুই বুকে তার সমুদ্রের আঁটোসাঁটো ঢেউ
নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, এ মুহূর্তে

কে তুমি কামিনী?

দুপুরের ফাঁকতালে চুপি চুপি আসবে কোনো গোপন প্রেমিক
এ তেমন ছেঁদো গল্প নয়
দু'-তিন ঘণ্টার জন্য শাড়ি ছেড়ে, সালোয়ার কামিজে সেজে
বাড়ি থেকে যাবে না সে
কোনোরূপ গোলকধাঁধায়
কৈশোরের গানের মাস্টারটির স্মৃতি আজ তুচ্ছ হয়ে গেছে
মাসতুতো দাদার বন্ধু, সবজান্তা, কর্পের মতো কান্তি
সন্দীপের মুখ মনে পড়লে হাসি পায়
উড়ো টেলিফোনও বন্ধ হয়ে গেছে চার বছর আগে
পোষা কোনো দুঃখ নেই, অলীক, শৌখিন
বুক ব্যথা কিছু নেই
এ জীবন স্বেচ্ছাকৃত, স্বামী ও সন্তানে সমর্পিত
সংসারের সব কিছু নিজে গড়া, নীল পর্দা, বাঁকুড়ার ঘোড়া
হুইস্কির বোতলে মানি প্ল্যান্ট, টবে লঙ্কা গাছে সাদা সাদা ফুল
একখানা যামিনী রায়, (আসল না কপি?) ভ্যান গঘের প্রিন্ট
সামনের আলমারিতে শুধু সুদৃশ্য ইংরিজি বই
কিছু বাংলা অত্যন্ত অন্দরে
সবই ঠিকঠাক আছে, তাই নয় কি অলকা বিশ্বাস?

তুমি কে? তুমি কে?
এমন দুপুরে মায়া হরিণীরা বিচরণে আসে
এমন দুপুরে রোদে ভোজবাজি ঝলসে ঝলসে ওঠে
এমন দুপুরে আধ-খোলা উপন্যাস কিংবা
কুরুশ কাঠির ভুল বোনা সোয়েটার

কিছুই পড়ে না মনে
পাহাড়ি নদীতে ভেসে আসে কাঠকুটো, ছিন্ন মালা
সিঁড়িতে কোথেকে এল এত জল, বৃষ্টি না
বন্যার মতো ঢল
দরজা বন্ধ, কেউ নেই, তুমি একা
একাকিত্বেরও চেয়ে একা
নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধু, তন্বী-শ্যামা উত্তর চল্লিশ
মেঘ ডাকছে বজ্র নাদে, কে তুমি, কে তুমি?
অলকা বিশ্বাস, সাড়ে তিনটেয় আছে নারী-সেবার মিটিং,
মনে নেই?
খিদে মনে নেই, ঘুম মনে নেই, ঘুগনি বানাবার কথা।
মনে নেই?

শরীরের মধ্যে মৃদু জ্বালা, বুকে কস্তুরীর ঘ্রাণ
শাড়ি ও সায়ার মধ্যে অস্তিত্বের তমসায় বাতাসের
মৃদু ফিসফিসানি
কে তুমি? কে তুমি?
ঝনঝন শব্দে একটা ছবি খসে পড়ল, এই তো
ফিরে পেলে হারানো তোমাকে!

গল্প

রঞ্জন গল্প শোনাচ্ছে গল্পরাও নির্মাণ করছে রঞ্জনকে
একতাল মাটি গড়া মূর্তির মতন মাঝে-মাঝে
বদলে যাচ্ছে তার মুখের আদল

নিপুণ শিল্পীর মতন গল্পগুলি পরীক্ষায় মেতে আছে
রঞ্জনের গাত্রবর্ণ নিয়ে
আমরা চেয়ারে বসে আছি, চেয়ারগুলো বসে আছে আমাদের
কোলে রেখে
যেমন আমরা বিছানায় শুলে বিছানারা আমাদের নিয়ে
ঘুমোয়
গল্পের চরিত্ররা মাঝে-মাঝে এসে ঘুরিয়ে দিচ্ছে
কাহিনীর মোড়
মাসতুতো বোন ও প্রবাসিনী বউদিরা ভাঁজ করে দিচ্ছে
সময়
পুরনো গল্পেরা খুলে ফেলছে পোশাক
নিরুদ্দিষ্টরা ফিরে আসছে সমুদ্র পেরিয়ে
বাবা বয়স কমিয়ে ছোট হয়ে যাচ্ছেন ছেলের থেকে
স্ত্রী ফিরে গেছে, মিলিয়ে গেছে কৈশোর প্রেমিকায়
সময় থেমে থাকে না, সময় পেছনে ফিরেও যায় না
অপরিকল্পিত এক একটি গল্প রঞ্জনের বুক
থেকে উঠে এসে কণ্ঠস্বরের অলিগলি ও সেতু
পেরিয়ে
বেরিয়ে আসছে খোলা মাঠে, যেন বিগত ও
অনাগতদের নিয়ে লোফালুফি
খেলছে রঙিন বেলুনের মতন
বেলুনের পেটে বেলুন, সহস্রার পদ্ম, পাপড়ি মেলে
দিচ্ছে, উড়ছে বাতাসে।

জীবনের আত্মজীবনী

আমার একত্রিশতম পূর্বপুরুষ
যখন একটি ছটফটে নদীর পাশে, ভর দুপুরে
খোলা মাঠে তার ছ'নম্বর রমণীটির সঙ্গে
চিৎ-উপুড় খেলায় হাঁপাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই
হঠাৎ তার পিঠের ওপর এসে বসল একটা বাজপাখি।
কী ঝামেলা!
বাজপাখিকে সরিয়ে দেওয়া যায় না, খেলাও বন্ধ করা যায় না
তখন নাকি আবার আকাশে আগুনের ছড়াছড়ি
দুই দিগন্ত থেকে ছুটে আসা ঝড় রং বদলাবদলি করছিল
ঘুমন্ত পাহাড়ের গায়ে ঘাস-আগাছার মধ্যে তুঁত বরণ ফুল
আর অনন্ত অবাক-চোখে ফড়িং
পায়রারা তাদের ঠোঁটে ধরে ধরেই খেয়ে ফেলছিল কচকচিয়ে
এই সবের মধ্যে হল কী
আমার ত্রিশতম ঠাকুরদা জন্মালেন অষ্টাবক্র হয়ে
তার চেহারাটা শালিক-শালিক আর ভেতরে
বাজপাখির আত্মা!

এই সবই লেখা আছে ধারাবাহিক জিনের আত্মজীবনীতে
আর সব আত্মজীবনীতেই কিছু কিছু ভুল থাকে ইতিহাসে
আগুন? না, সে সময়ের আকাশ ছিল ভবঘুরে সাদা
মেঘে ঢাকা?
হয়তো ঝড় ছাপিয়েও শোনা যাচ্ছিল মান ভাঙার গান
পায়রাগুলো সত্যিই হিংস্র ছিল? এখন তারাই

শান্তির পতাকায় পতপত করে
আমার নারীর কাছে, আমি, এক এক সময়
কী যে হয়, বাজপাখির মতন ডানা ঝাপটাতে যাই
সে খুব শান্ত, নীল স্বরে বলে, দেখো,
সরবিট্রেট রেখেছ তো জিভের তলায়?

জয়জয়ন্তী

পাঁচ মাত্রায় হেসে চলে গেল চাপা ফুল-রঙা সপ্তদশীটি
ট্রাম-ব্রেক কষা ধাতু-কর্কশ শব্দে বাজল কড়ি মধ্যম
সন্ধেবেলায় বাতাসে হঠাৎ এমনি এমনি শোনা যায় মৃদু
পূরবীর সুর
জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আমি কি সত্যিই শুনি, অথবা কিছু না
মাঠের মধ্যে তালগাছগুলো নন্দলালের ছবির মতন
বৃষ্টি-বিকেলে তারা আর গাছ থাকে না, শুধুই ছবি হয়ে যায়...

কী লাভ এসব দেখে, বা সুরের সঙ্গে আমার শ্রবণ মিলিয়ে
জীবন যাপনে এসব তুচ্ছ, জীবন শুধুই বাস্তব, তার লকলকে শিখা
ছড়িয়ে রয়েছে লোভে হিংসায়, শিশু হত্যায়, সবুজ ধ্বংসে
সেখানে শ্রী নেই, ক্রন্দন ছাড়া কোনো সুর নেই, ক্রোধ-লোভ ছাড়া
কোনো রস নেই
ভাঙছে মাটির দেয়াল, খনির গর্ভে মিশেছে কত কঙ্কাল
রক্তপাতের এত ছলছুতো, মানুষ নামের প্রাণীরা এ গ্রহে
কেন জন্মাল
আকাশে লক্ষ গ্রহ তারকায় আর কেউ আছে, কেউ কি দেখছে?

সুজলা, সুফলা এই পৃথিবীতে মানুষ মেতেছে কাল-সংহার
দারুণ খেলায়...

গালে হাত দিয়ে এই সব ভাবি, তবু কেন শুনি অন্তরীক্ষে
বাজায় না কেউ, তবু বেজে যায়, বাঁশির শব্দে জয়জয়ন্তী!

তবু একটা গভীর অরণ্য

জঙ্গল ক্রমশ কমে আসছে ঠিকই, তবু একটা গভীর অরণ্য
বেশি দূর যেতে হয় না, মাঝে মাঝে খুব কাছে আসে
নীরব পাঁশুটে গাছ, হাতছানি দেয় ছোট-বড় পরগাছা
পায়ে চলা সরু পথ, মাঝে মাঝে ঘোর অন্ধকার
জঙ্গল ক্রমশ কমে আসছে ঠিকই, তবু একটা গভীর অরণ্য–

বাতাসে কীসের শব্দ, বিন্দু বিন্দু আলো নয়, উড়ন্ত স্ফুলিঙ্গ
পাতা-পোড়ানিরা সব বৃত্ত হয়ে বসে আছে দীর্ঘ চুল মেলে
কেউ কারো দিকে চায় না, শোনা যায় দ্রিমি দ্রিমি ধ্বনি
এক দৌড়ে বাইরে আসা যায়, তবু পিছুটান গেঁথে থাকে পিঠে
জঙ্গল ক্রমশ কমে আসছে ঠিকই, তবু একটা গভীর অরণ্য–

ভাতের থালায় এসে উড়ে পড়ে পোকা ধরা অজানা বৃক্ষের
জীর্ণ পাতা
সিঁড়ির তলায় লম্বা সাপ আর পাহাড়ি ইঁদুর খেলা করে
খেলার ওদিকে আমি, বাড়িখানা ভাঙা মন্দিরের মতো নিথর নির্জন
একদা যেখানে ছিল ঝর্না তার শুকনো খাতে দিকহারা ফড়িঙের ঝাঁক
পাথরের খাঁজে বসে থাকা যায়, হাওয়ায় অসংখ্য দীর্ঘশ্বাস

জঙ্গল ক্রমশ কমে আসছে ঠিকই, তবু একটা গভীর অরণ্য
মাঝে মাঝে কাছে আসে, অথবা স্বেচ্ছায় তার গাঢ় তমসায় ছুটে যাই!

তুচ্ছ ছন্দ মিলে

মধ্য পুকুরে ডুব দিয়ে মাটি তোলা
দুপুর বেলায় বাজি ফেলা সেই আঁকুপাঁকু করা ত্রাস
এখন দরজা জানলাও সব খোলা
মধ্য বয়েসে ফিরে আসে সেই জলের কঠিন ফাঁস।

কৈশোর ছিল আজিব স্বপ্ন মাখা
এই লুকোচুরি, এই কান্নায় মায়ের আঁচলে চোখ
এই ভূমিতল, এই কাঁধে দুটি পাখা
নরকের খুব কাছ ঘেঁষে ছিল রঙিন অমৃত লোক!

সতেরো বছরে হয়েছিল রাহাজানি
প্রথম মৃত্যু, বিষটিষ নয়, বন্দুক বেয়নেট
করমচা-রং মেয়েটির হাতখানি
বুক ছুঁয়েছিল, আল্পনা পায়ে এই মাথা ছিল হেঁট।

মধ্যবয়েসে স্বপ্ন দেখার মানা
দুপুরের ঘুমে কায়াহীন ছায়া-শরীরেরা আসে ফিরে
ব্যর্থ প্রণয় মনোলোকে দেয় হানা
মুখহীন নারী চকিতে হারায় গড়িয়াহাটের ভিড়ে।

দের্শ না পৃথিবী, কে যে দিয়েছিল ডাক
মনেও পড়ে না, হাঁটুর ব্যথাটা বেশি করে চাড় দিলে

সত্যি-মিথ্যে, মাঝখানে থাকে ফাঁক
কবিতা লেখায় নিজেকে লুকোই তুচ্ছ ছন্দ-মিলে।

তুম্বুনিতে সেই রাত্রি

তুম্বুনিতে সেই রাত্রি, মাঠের মধ্যে ঘোর অন্ধকার
বসন্ত পোদ্দার নামে দৈত্যাকার মারাঠি যুবক
আর কঠোর চেহারার কুসুমকোমল রশিদ খান
শক্তির দাপাদাপি আর সন্দীপনের জাদুবাস্তবতার প্রতিশ্রুতি
সবচেয়ে কৃশকায়, সবচেয়ে মায়াময় যোগব্রত
চাঁদ উঠবে না, আলপথে অনেক গর্ত ও রিপুভয়
হঠাৎ হঠাৎ পুরুষকারের ঠোকাঠুকি, অট্টহাসি ও
মধুমাখানো ছুরির সংলাপ
এবং গান, আমরা হাঁটছি, যে কেউ বেসুরো হবার জন্য স্বাধীন
তারই মধ্যে কোথায় ছুটে গেল যোগব্রত, একটা প্রবল
ই-ই শব্দ করে, অভিমানের কুয়াশা মেখে
আমরা থমকে যাই, সিগারেট ছুঁড়ে ফেলি
আকাশে উড়ন্ত বাদুড়, কোথাও ডাকছে প্যাঁচা, আর
কেন এত ঝিঁঝিঁর ডাক
এগারোটি কণ্ঠে সেই পাতলা যুবকটির নাম ধরে চিৎকার করে
টুপটাপ খসে পড়ে এক একটা নক্ষত্র, উল্কা ছুটে যায়
তুম্বুনির মাঠে আমরা ডেকে চলেছি গলা চিরে
যোগব্রত ফিরে আয়, যোগব্রত, ফিরে আয়, ফিরে আয়
যুদ্ধযাত্রী পুরুষেরা হাহাকার করছে একজনের জন্য
অভিমান ছাড়া যার আর কোনো হাতিয়ার নেই।

দরজার কাছে এসে

দরজার কাছে এসে কে দাঁড়িয়ে আছে
ভিজে-পা খালি-পা এক নারী

তোমার তো দেখার দরকার কিছু নেই
তুমি থাকো সহস্র ব্যস্ততা-নির্বাসনে
ঠান্ডা হোক সকালের চা, তুমি খাও চিঠির কাগজ
তুমি খাও টেলিফোন, তোমাকেও খেয়ে নিক কিছু লোভী চোখ
বিভিন্ন হাতের পাঞ্জা, মানুষের ভাষা।

দরজার কাছে এসে কে দাঁড়িয়ে আছে
ভিজে-পা খালি-পা এক জনমদুখিনী

কে ডাকছে? এগারো রকম কণ্ঠস্বর
একই উত্তর
শরীর জাগ্রত, অন্য শরীরের টান
রং দিয়ে মুছে দাও, কিংবা থাকো ঘুমের গভীরে
জামার বোতাম একটা অসময়ে ছিঁড়ে যেতে পারে?
দুআঙুলে ছুঁয়ে দিলে বুক।

দরজার কাছে এসে কে দাঁড়িয়ে আছে
ভিজে-পা খালি-পা এক জীবনসর্বস্ব।

দেশ-কাল-মানুষ

যে আমি এককালে দেশকে ভালোবেসে গেয়েছি কত গান
দেশের ডাক শুনে, অথবা না শুনেও, চেয়েছি প্রাণ দিতে
মুঠোয় আমলকী, ব্যাকুল কৈশোর, ভুলেছি জননীকে
দেশই গরিয়সী, স্বপ্ন মাখা রূপ দেখেছি দিকে দিকে
সে আমি ইদানীং আয়না-সম্মুখে বিরলে কথা বলি
শূন্য করতল, পাথর অভিমান, একলা পথ চলি
জন্ম দৈবাৎ, কোথায় কোন্ মাটি, তা কেন দেশ হবে...

[এভাবে লিখতে লিখতে একেবারে অন্তঃস্থলের ক্ষোভ এমনই ফেটে বেরুতে চায় যে মনে হয়, এখন ছন্দমিল দিয়ে লেখা আমার পক্ষে একধরনের আত্মপ্রবঞ্চনা। তাই অতি দ্রুত আবার অন্যভাবে লিখতে শুরু করি...]

যে-আমি একসময় কত দেশ দেশ বলে গান গেয়ে গলা ফাটিয়েছি
দেশের ডাক শুনে, আসলে সেরকম কিছু না শুনে
পেছন দিকের ধাক্কায় চেয়েছি প্রাণ
দিতে মুঠোয় ছিল আমলকী, সেই পাগল পাগল কৈশোরে
নিজের মাকেও ভুলে গিয়ে দেশকেই মনে হত গরিয়সী
কত স্বপ্ন দিয়ে গড়া একখানা অপার্থিব প্রতিমা
সেই আমি ইদানীং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভুরু কুঁচকে আত্মধিক্কার দিই
খবরের কাগজের ওপর থুথু ফেলতে ইচ্ছে হয়
আকস্মিকতাতেই সকলের জন্ম, যে-কোনও মাটিতে, গাছের মতন
দেশ আবার কী, নিছক ছেলে ভুলোনো রূপকথা
ক্ষমতালিপ্সুরাই পৃথিবীটাকে টুকরো টুকরো করে দেশ বানিয়েছে

সমস্ত সীমান্তগুলিই লোভ আর দম্ভ দিয়ে ঘেরা
স্বদেশবন্দনার কাব্য আর গান শুধু অবোধ, আবেগতাড়িতদের
মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ার ভাঁওতা
দেশ মানে বন্দিত্ব, দেশ মানে অন্ধ কুসংস্কার
জীবনধারিণী ধরিত্রীর সারা দেহে অনবরত ছুরি মেরে চলেছে
মানবসন্তানেরা!

যে- আমি ঈশ্বর কিংবা দেবলোক অস্বীকার করে এসেছি
প্রথমযৌবন থেকে
স্বর্গ-নরক নস্যাৎ করে ধন্য মনে করেছি শুধু একবারের মতন।
মনুষ্যজন্মকে
মানুষকে মনে করেছি অমৃতের সন্তান
মানুষের জন্য পারস্পরিক হাতে হাত ধরা, বুকের উত্তাপ,
মানুষের জন্য ভালোবাসা
শিশুকে আদর, নারীর সুঘ্রাণ, প্রেমেই স্বার্থক ইহলোক
সেই আমিই এখন মানুষকে ভয় পাই, শিউরে উঠি জনসমষ্টি দেখে
মানুষ কোথায়, পৃথিবী ভরে গেছে ছদ্মবেশী অমানুষে
যারা প্রতিবেশী শিশুকে ছুড়ে দেয় দাউ দাউ আগুনে, তারা মানুষ?
যারা ধর্মের নামে এক হাস্যকর গুজবে মেতে উঠে
রক্তের গঙ্গা বইয়ে দেয়, তারা মানুষ?
যারা নিতান্ত পেশিশক্তিতে নারীকে ধর্ষণ করে, তারপর
খণ্ড খণ্ড করে তাকে কাটে,
তারা মানুষ?
যারা মন্দির, মসজিদ, গির্জা গড়ে তারপর এ ওরটা ভাঙে,
সে তারটা ভাঙে, ছিন্নমুণ্ড দিয়ে ভিত গাঁথে,
তারা কি মানুষ?

যারা এইসব ভাঙাভাঙি আড়চোখে দেখে, হত্যালীলায়
হাততালি দেয়
তারা কি মানুষ?
যারা ধ্বংসের অস্ত্র ছড়ায়, অনবরত ধ্বংসের উস্কানি দিয়ে
নিজের সন্তানদের দুধে ভাতে রাখে আর বিকেলবেলা
কুকুর নিয়ে বেড়াতে যায়,
তারা কি মানুষ?
মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো নাকি পাপ
আমি যে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছি, কিছুতেই আঁকড়ে রাখতে পারছি না
এই সব কিছুর জন্য নিজের জন্মটাকেই দায়ী মনে হয়।

যারা আমার পরে জন্মেছে ও জন্মাবে
তাদের জন্য কেমন থাকবে এই পৃথিবীটা? আমি
শেষের দিকে কোনও কৃত্রিম, অবিশ্বাসী
আশাবাদ শোনাতে পারব না
তারা কি পারবে সমস্ত দেশগুলির সীমানা মুছে দিতে
অথবা সমুদ্রগুলি ভরে যাবে রক্তে?
তারা কি সমস্ত ধর্মগুলোকে গু লাগা কাগজের মতন ফেলে দিতে
পারবে আবর্জনায়?
(অথবা একটু ভালো করে বলতে গেলে ধর্মগুলিকে ঠেলে দেবে ইতিহাসে?)
অথবা ধর্মধ্বজীরা আরও বেড়ে উঠবে রক্তবীজের মতন?
ঈশ্বরবিশ্বাসীরা কি তাদের ঈশ্বরকে দাড় করাতে পারবে কাঠগড়ায়?
পরিশ্রমের ফসল সবাই ভাগ করে নেবে, না অনবরত কেড়ে নেবে
অন্যের মুখের অন্ন
তারা লাইব্রেরি পোড়াবে, তাজমহলে গিয়ে গণপেচ্ছাপ করবে
হে অনাগত ভবিষ্যৎ ও পর-প্রজন্ম, তোমাদের জন্য আমরা কিছুই

রেখে যেতে পারলাম না,
ব্যর্থতা ছাড়া!

[অথবা এসবই কি আমার নিজস্ব নৈরাশ্য?
অন্য কোথাও আছে অন্য মানুষ, যারা এই সব কিছু বদলে দেবে?
তারা পারবে, ঠিক পারবে তো? সত্যিই আছে
সেই অন্য মানুষ
আমি কি তাদের দেখে যেতে পারব?]

ধ্যান ভঙ্গ

আমার সেই অরণ্য প্রবাসে, উপবাস-খিন্ন দেহের সামনে
তুমি পায়সান্নের বাটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলে না?
গাছতলার আলো ছায়ায় আর কেউ ছিল না
আমার সমস্ত শরীরময় ক্ষুধা
তবু আমি প্রথমেই সুঘ্রাণ চরুর জন্য লোভ করিনি
আগে দেখেছি তোমার পায়ের পাতা
পদনখে কয়েক সহস্র চাঁদ, আলতা রাঙা গোড়ালি
মাঝখানে লাল রঙের পৃথিবী
তারপর দুটি পা বেয়ে ওঠা হিলহিলে লাবণ্য
চালতা ফলের মতন গুল্ক, ভাঙা পর্বতশৃঙ্গের
মতন জানু
ছাল ছাড়ানো কলা গাছের মতন ঊরুদ্বয়
হে রম্ভোরু, আমি কেঁপে উঠেছিলাম
কোথায় গেল আমার ক্ষুধা ও ক্ষুদ্র তৃষ্ণা

তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়েছিলে সুমেরু
আড়াল করে
নাভিতে মেঘলুপ্ত চাঁদ
কী গভীর রহস্যময় যোনিদেশ
যেন বিষাদময় এক ঝর্নার উৎসমুখ
মরাল গ্রীবার মতন তোমার দুটি হাত
সদ্য ফোটা পদ্মের মতন দুটি সুগন্ধ স্তন
না, তোমার হাতে ধরা সোনার পাত্রটি আগে দেখিনি দেখেছি
তোমার ময়ূর-নিন্দিত গ্রীবা, দেখেছি
তোমার শিশু-সারল্যের থুতনি
নদীর বাঁকের মতন দুটি চোখ
উড়ন্ত ভুরু, দৃষ্টিতে বৃষ্টিস্নাত রোদ...
কীসের জন্য কেন যে বেঁচে আছি, তা জানি না
'অয়ি' বলে তোমাকে ডাকতে ইচ্ছে হয়
আর ফিরে আসবে না?
সমগ্রতায় যদি নাও আসতে পারো
শুধু দুটি রক্তিম পায়ের পাতা
নাভিতে সদ্য বিলুপ্ত চাঁদ, ভুরুতে অচিন পাখি
দাঁড়িয়ে থাকার নিস্তব্ধ সঙ্গীত, ঊরুর বিষণ্ণতা
কিছু একটা দেখা দাও
ধ্যান ভেঙে বসে আছি, দেখা দাও, দেখা দাও!

প্রকৃতির প্রতিশোধ

শেখ সুলেমান একটা চড় মেরেছিল নীলোফারের ভাই, বাচ্চা মজনুকে
সাতজেলিয়া থেকে মোল্লাখালি যাবার খেয়া নৌকো
এমনই কুমড়ো গাদা যে সবাই সবার গা ঘেঁষে আছে
বেশি টালমাটাল হলেই উল্টে যাবে ভরা বর্ষার রায়মঙ্গলে।
শতকরা সাতষট্টি জন যাত্রী সুলেমানের এই বেয়াদপি
মেনে নেয়নি মনে মনে
কিন্তু শেখের বিরুদ্ধে কে মুখ খুলবে, সবাই চুপ
আর শতকরা একুশ জন (হিসেবে মিলল না, তাই না?
কিছু লোক তো সব সময়ই বাইরে থাকে)
সুলেমানের সমর্থনে হেসে উঠল খলখলিয়ে
অবশ্য তারা সবাই জানে, পা মাড়িয়ে দেবার জন্য
মজনুকে চড় মারলেও
সুলেমানের আসল নজর ছিল নীলোফারের অপূর্ব দুটি
স্তনের ডৌলের দিকে
এ রূপ দেখলে ফেরেস্তাদেরও মতিভ্রম হতে পারে
কিন্তু মাছওয়ালি নীলোফার যে বড় বেশি সতীত্বের ছেনালি দেখায়।

একটা বাচ্চাকে চড় মারলে সে ঘটনা বেশিদূর গড়ায় না
খেয়া নৌকো ওপারে পৌঁছয়, সবাই ভুলে যায়, শুধু মজনু
কুঁ কুঁ করে মৃদু মৃদু কাঁদে
নীলোফার একবার মাত্র রক্ত চোখের ঝলক দিয়েছে
সুলেমান সাহেবের দিকে
তারপর বেশ কিছুদিন আর যায় না সাতজেলিয়ার হাটে

মজনু কোথায় কেউ তার খবরও রাখে না।
শেখ সুলেমান ধর্মপ্রাণ মানুষ এবং নানান কাজে ব্যস্ত
তার চোরাই কাঠের ব্যবসা, তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার
সময় নেই
তা ছাড়া কেউ মুরুব্বির পা মাড়িয়ে দিলে তাকে চড় মারায়
দোষ হবে কেন?
তবু শেখ সুলেমান হঠাৎ হঠাৎ দেখতে পায়
নীলোফারের ঊরু জড়িয়ে ধরা কিশোরটির কান্না ভরা মুখ
খেয়াঘাটের বট গাছটা হঠাৎ তাকে বলে, ছি ছি, সুলেমান
শীতকালের আকাশের বিদ্যুৎ তাকে বলে, ছি ছি, সুলেমান
একটা লণ্ঠের ভোঁ তাকে বলে, ছি ছি, সুলেমান
ফিনফিনে বাতাস তার কানে কানে বলে যায়, ছি ছি, সুলেমান
এ গ্রামের মানুষজন শেখ সুলেমানকে কিছু বলে না,
কিন্তু প্রকৃতি তাকে যেন ভূতের মতন তাড়া করছে
নৌকোর দাড়ের শব্দের মধ্যেও ছি ছি
গরম ভাতের থালায় ফিসফিস করে ছি ছি
যে হাত দিয়ে সে থাবড়া মেরেছিল, সেই হাতের তালুতে
লেখা ফুটে ওঠে ছি ছি
সুলেমান ক্ষমা চাইতে চায়। কিন্তু কোথায় নীলোফার, কোথায় মজনু
তারা আর দেখা দেবে না কোনোদিন।
মজনু ক্ষমা না করলে চিরকালই অদেখা থেকে যাবে
নীলোফারের বুকের ডৌল
এই দুঃখে মাটিতে গড়াগড়ি দেয় শেখ সুলেমান।

প্রথম দেখার মতো

প্রতিবার দেখা, কিছু নীরবতা, প্রথম দেখার মতো
নম্র গোধূলি, মায়া দর্পণ, আলো যেন জলকণা
সহস্র ঢেউ, চার পাশে, তার মাঝখানে এক দ্বীপ
দূর থেকে, যেন কল্পলোকের ওপারে দাঁড়িয়ে কথা।

গোধূলিও নয়, শহুরে সন্ধে, ভিড় ঠেলে ঠেলে আসা
ঝুলকালি মাখা ধোঁয়াটে নগরী, পদে পদে পিছু টান
তবু সেই দ্বীপ,দু' চোখের দ্যুতি, এসেছি তোমার কাছে
প্রতিবার দেখা, কিছু নীরবতা, প্রথম দেখার মতো!

বহুরূপীর গীতা

গোড়ালি-ডোবা কাদার মধ্যে হেঁটে যাচ্ছি গড়বন্দিপুরের দিকে
একটা অশথ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ
আকাশে উড়ছে শকুন, পুকুর হওয়া মাঠে জাল ফেলছে
এক ঠেঙো-ধুতি জেলে
এক দঙ্গল বাঁদর-সাজা ছেলেমেয়ে তাড়া করছে একটা কুকুরকে...
মাথায় ময়ূরের পালক, মুখের রং নীল ধরনের, জরির পোশাক পরা
কৃষ্ণ একমনে বিড়ি খাচ্ছে
অনেকদিন বহুরূপী দেখিনি
একটানা বৃষ্টির মাসে বহুরূপীটির বোধহয় বাজার খারাপ
কেউ আর ও-সব আমোদে পয়সা দিতে চায় না

সঙ্গীদের থামতে বলে তার সামনে গিয়ে বললুম, কী গো ভাইটি,
তুমি কি গড়বন্দিপুরে থাকো,
সেখানকার খবর কী?
হাতে সুদর্শন চক্র নেই বটে, তবু তীব্র চোখে তাকিয়ে
নব দূর্বাদলশ্যাম শ্রীকৃষ্ণ যা বলতে লাগলেন, তা অবশ্যই এক
নতুন গীতা!

তোমরা বাবুরা সেখানে হঠাৎ উদয় হচ্ছো কেন গো?
ভোট আবার এসে গেল বুঝি?
হঠাৎ দাঙ্গা-টাঙ্গা লেগে গেল নাকি?
কাঁধের ঝোলায় জলের বোতল আছে, তাই না?
আমাদের গায়ের জল খেলে তোমাদের ওলাউঠো হয়,
আমাদের হয় না
সাপের বিষের ওষুধ এনেছ? কালকেই আজু শেখের এন্তেকাল
হয়ে গেল
মা মনসার বিষের ছোবলে!
বীজতলা রোয়ার সময় বৃষ্টি এল না
বৃষ্টি নেই, আকাশ শুকনো, মানুষের মুখও আমসি
এখন আবার শালা এত বৃষ্টি পড়ছে, পড়ছে তো পড়ছেই,
সব ভেসে গেল
এতে আর গরমিন্ট কী করবে, গরমিন্ট তো ভগমানের মতন
আকাশ সামলাতে পারবে না
কিন্তু ইস্কুলে একটাও ম্যাস্টার নেই, তা পাঠাতে পারো না?

আমার একজন সঙ্গী বলল, এ সব তুমি কী বলছ, বহুরূপীদা
সবই তো জানি, গ্রাম তো আর রাতারাতি বদলায় না

কিন্তু গ্রাম-পঞ্চায়েত কতটুকু কাজ করেছে, আর
আপনিই বা কী করেছেন?

এবার শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হাসলেন
মুখের চেহারাটা বদলে গেল, গাঢ় কণ্ঠস্বরে বলতে লাগলেন
এই কলি যুগের মুক্তির উপায় বড় জটিল
একটা বিশাল গুহা, তার মধ্যে সবাই ঢুকে যাচ্ছে দলে দলে
স্বামী পোড়াচ্ছে স্ত্রীকে, স্ত্রী খেয়ে ফেলছে স্বামীকে
সন্তানরা বাবার পরিচয় না জানলেই ধর্মও জানবে না
বাচ্চারা হাতের আঙুলের বদলে পায়ের আঙুল চুষতে শিখবে
ছোট মেয়েরা অদৃশ্য হয়ে যাবে পূর্ণিমার রাতে
চোরদের ধরে এনে পদ্মবনের সামনে দাঁড় করালেই তারা কাঁদবে
কুকুরে চাটবে হিন্দু-মুসলমানের মারামারির রক্ত
তখন বিধবা লক্ষ্মী আর নীলোফার এ ওকে জড়িয়ে ধরবে
ধানের দুধ পোকায় খাবে না, আমি খাব
একটা নদী ঘরের দরজার কাছে এসে বলবে, ওগো,
আমায় রাত্তিরটা থাকতে দেবে?
একটা পুঁটি মাছ পৌঁছে যাবে সমুদ্রে
কুমিরেরা দর্জির দোকানে জামাকাপড়ের মাপ দেবে
আর আকাশ থেকে খসে পড়া একটা তারা নাচবে উদোম হয়ে
তোমরা অবশ্য কিছুই দেখতে পাবে না, সবই অদৃশ্য,
হা-হা-হা, সবই মায়া!
আমি মহাভারতের খটোমটো গীতা কখনো ভালো করে
বুঝতে পারিনি
স্বয়ং বেদব্যাসও কি বুঝতে পারতেন এই নতুন গীতা?

বাংলা চার অক্ষর

ওকে অন্য একটা সেঞ্চুরি দাও
ষোড়শ কিংবা সপ্তদশ
তখন দেখবে চকমকাচ্ছে ওর আসল তেজ
বলেছিলেন কমলকুমার
তবে কি আমি এ যুগের উপযুক্ত নই?
এসব রাস্তা চিনি না বলেই এত হোঁচট খাই।
এখনও নৌকো দেখলে উচ্ছল হই। বিমানে উঠি বাধ্য হয়ে
ধ্রুবাদুরদের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করি, বাউল ফকিরদের সঙ্গেও
চার্বাকপন্থীদের সঙ্গে গলা মিলিয়েছি
যেতে ইচ্ছে করে সমস্ত সীমান্তের ওপারে
রথের মেলায় হারিয়ে গিয়ে এক চাষির বাড়িতে শুয়ে থাকি
অন্ধ কিশোরীটিকে দেখে মনে হয় ওর স্পর্শে।
আমার কপাল জুড়োবে
যখন দিনদুপুরে দেখতে পাই উল্লুকদের উৎপাত
কোমর বন্ধ না থাকলেও আমি অদৃশ্য তলোয়ার খুঁজি।

কিন্তু আমি তো ছেঁড়া চটি পরে মন্দিরের পাশ দিয়ে
যেতে যেতে থেমে গিয়ে প্রণাম করিনি কখনও
রামধনুকে জেনেছি শুধু জলবিন্দুর কারুকার্য
ফ্রয়েড, ডারউইন ও কার্ল মার্কস, এই তিন দাড়িওয়ালার
উত্তরাধিকার মেনে নিয়েছি
অনুভব করেছি আইনস্টাইনের শেষ জীবনের মনোবেদনা
ইন্টারনেটে দেখি বিশ্বকে, ই-মেইলে চিঠি পাঠাই

তবু কমলদা, আপনি ঠিকই বলেছিলেন
আমার কিছুতেই পছন্দ হচ্ছে না এই সেঞ্চুরিটা
কুড়ি থেকে একুশে পা, তবু সাবালক হচ্ছে না এই সভ্যতা
চতুর্দিকে কীসের এত শব্দ, অধঃপতনের?

আপনি কোন সেঞ্চুরিতে আছেন, কমলদা, তেইশ না চব্বিশ?
তখন কি বাতাসে পেট্রোল-ডিজেলের গন্ধের বদলে
বনতুলসীর গন্ধ ফিরে আসবে
শরীরের উন্মাদনাকে ঘিরে থাকবে একটা কিছু পবিত্রতা
রাত জেগে আয়ুক্ষয় করবে কবিরা
চার অক্ষরের শব্দের মধ্যে বাংলা ভালোবাসা
প্রথম স্থান অধিকার করে নেবে?

বাজের শব্দ

স্নান করতে দেরি হয়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে মেল
ট্রেনের মতন ছুটে আসছে খিদে, অথচ কয়েক
লাইন লেখা বাকি। এই সময় হঠাৎ যদি
একটা প্রচণ্ড
বাজ পড়ে? তাহলে আমি মেল ট্রেনটাকেই
খাব, না-লেখা লাইনগুলো স্নান করবে,
আর বাজের মধ্যে শিশুর কান্নার মতন একটা
শব্দ শোনা যাবে, খিদে, খিদে, খিদে!

ভুল বোঝাবুঝি

ধড়াম করে দ্রুত দরজাটা বন্ধ করার পরই মনে হল
এই ব্যস্ততা কি ভুল বুঝবে দরজাটা?
এত জোর শব্দ তো তাকে অপমান করাও বটে
তা হলে কি তুমি চাবি দিয়ে খুলে আবার যাবে ভেতরে
ধীরে সুস্থে এক পা এক পা এগোতে এগোতে ক্ষমা চাইবে?
সারা পৃথিবী তোমাকে মনে করবে পাগল।

সিড়ি দিয়ে হুড়মুড়িয়ে নামতে নামতে হঠাৎ দেখতে পেলে
একটা চড়ুই পাখির বাচ্চা চিঁ চিঁ করছে
ওপরের ঘুলঘুলিতে বাসা, বাচ্চাটা পড়ে গেছে নীচে
মা-পাখিটা ডাকাডাকি করছে ব্যাকুল ভাবে
তুমি পাশ কাটিয়ে নেমে গেলে খানিকটা
জরুরি কাজের বিশ্ব সংসার টানছে তোমার কান ধরে
তবু তুমি থমকে গেলে, ফিরে আসতে শুরু করলে
বাচ্চাটাকে ওর মায়ের কাছে, বাসায় তুলে দিলে
এখনো বাঁচানো যেতে পারে।
সেটাও কি জরুরি নয়?
মা-পাখিটা অন্য স্বরে চিৎকার করে ঘুরতে লাগল
তোমার মাথার ওপরে
এই রে, ওকি ভাবছে, তুমি বাচ্চাটাকে মেরে ফেলতে চাইছ?
মানুষ পাখিদের মারে কিংবা বন্দি করে, মানুষ কি পাখিদের বাঁচায়?
মা-পাখিটা ভয় পাচ্ছে, তোমার হাতের তেলোয় বাচ্চাটা, কয়েকটি মুহূর্ত,
কয়েকটি মুহূর্ত

যদি বাচ্চাটা সত্যি মরে যায়?

মানুষ হারিয়ে যায়

মানুষ হারিয়ে যায়, চতুর্দিকে হারানো মানুষ
সকলেরই নাম আছে
কেউ কারো ঠিকানা জানে না
নিজেরই বাড়িতে এসে মনে হয় অচেনা সবাই
এক একটা মুহূর্ত আসে
সব কিছু ভুল হয়ে যায়
যেন ভুল করে ফেরা, কথা ছিল অন্য কোনোখানে;

মানুষ হারিয়ে যায়, চতুর্দিকে হারানো মানুষ
যেন অন্য পোশাকের
আড়ালে লুকিয়ে থাকে কেউ
নাম ধরে ডাকাডাকি, চোখে ফুটে ওঠে অন্য ভাষা
ভুল মর্ম, ভুল নর্ম
তাই নিয়ে কাটে সারাবেলা
সবাই অন্যকে খোঁজে, শুধু কেউ নিজেকে খোঁজে না!

মেঘমল্লার

ভীমসেন যোশীর মেঘমল্লার শুনতে-শুনতে বৃষ্টি নেমে এল। অবশ্য
এ কথা আকাশও জানে, এখন বৃষ্টি না-দিলে মেঘেরা হাঙ্গার-স্ট্রাইক করে বসবে।
কোমল শুদ্ধের মধ্যে খেলা করছে দুর্জয় নিখাদ, এখনো নামেনি সন্ধে, কদম্বের

ডালে বসে আছে অতি একলা মাছরাঙা। শাহজাদির ওড়নার মতন
ঝিলমিলে বাতাস
খুশির ছলে ছুঁয়ে যাচ্ছে পুরনো লোহার দরজার বুক, ক্ষুধার্ত নদীটি এবং
একলা নদীটি আজ সহসা এমন ভাগ্যে সাজপোশাক সব খুলে নৃত্যে মেতে উঠল
ভীমসেন যোশী কি কিছু জানলেন, না বুঝলেন? ক' টাকা পেলেন এই
রেকর্ডিং-এর জন্য?
কোনো-কোনো জলসা হয় সারারাত, ভীমসেন ঘুমোবার সময় পান
না। এখন অন্যের গান, ভীমসেন বসে আছেন, রাত তিনটে, ফেরার ব্যবস্থা
ঠিক নেই। মদ্যপান ছেড়েছেন শোনা যায়। স্থির দৃষ্টি, হাঁটুর ওপর ধুতি
শুন্য করতল। হঠাৎ নবৃষ্টি, প্রতিটি ফোঁটার শব্দ তবলার বোল কিনা,
তিনি ছাড়া আর কে বুঝবেন? লয় ঠিক নেই, সমে ভুল, ভীমসেন মাথা
দোলাচ্ছেন আর কুঁচকে যাচ্ছে ভুরু তারপর তিনি অদৃশ্য। দরজায় কেউ যেন লাথি
মেরে গেল। এখন মাঝারি মাপের মানুষেরা পরিবেশন করে যাচ্ছে মাঝারি
সঙ্গীত। বিরাট বজ্রপাতের শব্দে স্পষ্ট হলকতান। আকাশে
আহমদ জান থেরাকুয়া আর তার সঙ্গে টক্কর দিচ্ছেন পাগলা ভীমসেন!

রাধা

কোন ঘাটে যাবি রাধা, যে-ঘাটে রয়েছে
কালো বাঘটা ঘাপটি মেরে?
আর সব ঘাটে দেখ, দু' পয়সার বিকিকিনি
ঠিকঠাক চলেছে
পারানিরা চেনা শুনো, কড়ি বুঝে নেয়,
ঘর গেরস্থালি সব অবিকল থাকে
তুই কেন যাস সখী জেনে শুনে ভুলপথে

বাঘের খপ্পরে?
ও রাধা আয় রে ফিরে, আমরা সবাই
বসে আছি
এই যমুনার তীরে।

রাধার কোমর থেকে গাগরি উছলে ওঠে
দু'পায়ের মলে যেন লেগেছে তুফান
বাঘটা ডাকেনি তাকে, চুপ করে চেয়ে আছে
কে ডেকেছে, কে টেনেছে তাকে?
বুকে হাত দিয়ে দেখে, উথাল পাথাল, যেন
সমস্ত সংসার নিরুদ্দেশ
নীবিবন্ধে এ কী জ্বালা, দূর ছাই, এ মরণে
কত সুখ, কেউ তা জানবে না!

রাশি রাশি শুকনো পাতা

সবাই অনেক কিছু জেনে গেছে, যে-সব জানার কোনো
দরকারই ছিল না
এত সব অকিঞ্চিৎকর জানার আবর্জনা ভর্তি মাথা
তাই তো পদক্ষেপে মাঝেমাঝেই থাকে না নিজস্বতা

সমস্ত রাস্তাই যদি চেনা হয়ে যায়, তখনও
উন্মুখ প্রতীক্ষায় থাকে কয়েকটি অচেনা
স্বপ্নগুলোও সরল, সাদাসিধে হয়ে গেলে
আর বেঁচে থাকারই কোনো মানে থাকে না।

এই দেশের বুকের মধ্যেও রয়েছে একটা গোপন
দেশ পরিচিত মানুষের ভিড়ে একটি রহস্যময় মুখ
গণ্ডি এঁকে ঘিরে রাখা নারীর আঁচল ওড়ে, ঢেকে দেয় চোখ
আর তখনই সমস্ত গণ্ডির বাইরে ছুটে যায় অসংখ্য পলাতক
একটি মৃত নদীর গর্ভে শোনা যায় কুলুকুলু ধ্বনি
বাতাসে কীসের ঘ্রাণ, যেন যাত্রা শুরু হবে আবার
শৈশব থেকে, কিংবা মধ্য বয়েস থমকে গিয়ে ঘাড় ফেরায়
গাছের মতনই পাতা ঝরে, পাতা ওড়ে, রাশি রাশি
শুকনো পাতা...

রিঙ্কু-রঞ্জনের বাড়ির কোলাজ

হলুদ রঙের ডুবো-তরী, কে আসছে কে যাচ্ছে,
কেউ ভাসছে নীল বাতাসে

সিঁড়িতে বসা দুই কিশোর, বাংলা গলায় স্পেনীয় গান,
টুঙ্গি ঘরে ছবির পর ছবি

এই সকাল, এই বিকেল, কয়েকখানা মহাদেশের
গল্পে মেতে থাকা মধ্যরাত

কাজের মেয়ে কবিতা পড়ে, ফোন বাজছে,
মোটর সাইকেলের শব্দ হঠাৎ দরজায়

দৃশ্য ও অদৃশ্য জীবন, অতীত এবং ভবিষ্যৎ গলা জড়িয়ে
খুলছে সব জানলা

একটি বিন্দু আলো কিংবা অন্ধকার, একটি বিন্দু বহুবর্ণ
এক-একবার হাতের মুঠোয়, এক-একবার
শূন্যে

হলুদ রঙের ডুবো-তরী, কে আসছে, কে যাচ্ছে,
কেউ ভাসছে নীল বাতাসে...

সম্বোধনে মরীচিকা

চিঠিতে তোমাকে সম্বোধন করতাম, ওগো মরীচিকা, তাই না?
তখন বয়েস ছিল তেইশ, মরুভূমিটি দিগন্ত ছড়ানো, আর
সব সময় তৃষ্ণায় আমার গলা শুকিয়ে কাঠ
তুমি কখনো কখনো দাঁড়াতে এসে ঝুল বারান্দায়
সমুজ্জ্বল দন্তরুচির হাসিতে, এক পাশে মুখ ফিরিয়ে
ছড়িয়ে দিতে ছাতিম ফুলের মতন কিছু পরাগরেণু
তারপরেই আমার জ্বর হত
দেখা, চেনা হাসি, কিন্তু কাছে ডাকতে না
জ্বর হলেই আমার চিঠি লেখার ইচ্ছে হত খুব
রক্ত মাখা পরাবাস্তব চিঠি শুধু এক শো চার ডিগ্রি জ্বরেই লেখা যায়
আমার সারা শরীরে মরুভূমির বাতাস, অন্তঃস্থল পর্যন্ত
দগ্ধ করে দিচ্ছে
চিঠির অক্ষরে পিণ্ডি চটকাতাম বাংলা ভাষার

কখনো কখনো তোমাকে মনে মনে রাক্ষসীও বলতাম
তোমার ঠোঁটে রক্ত, টপটপ করে ঝরে পড়ছে, আমারই রক্ত
সে রকমই দেখতাম, কেমন স্বাদ বলো তো, জিজ্ঞেস করিনি।

যেবার তুমি হঠাৎ সিঙ্গাপুর চলে গেলে কোনো ইঙ্গিত না দিয়ে
সেবারে না-লেখা চিঠিতে তিনবার বলেছিলাম, হারামজাদি!
এতদিন পর সত্যি কথা বলছি, এখন আর লজ্জা কী, বলো
ছাদে উঠে নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে তাকিয়ে ভেবেছিলাম
এর নাম কি প্রেম, না নারী-মাংস চেটেপুটে খাবার তীব্র বাসনা?
কিন্তু তুমি তো নারী নও
তুমি নারী ছিলে না, নারীর আদল, কুয়াশা ভেদ করা
এক বিমূর্ত অভিমান
না হলে সুহৃদয়ের বোন মণিদীপা কী দোষ করল
তার স্তন দুটি ও উরুর ডৌল তো তোমার চেয়ে মন্দ বলা যায় না
আমি বেকার জেনেও মণিদীপা আমার দিকে তরল করেছিল চোখ
একদিন সারা দুপুর কেউ নেই, মণিদীপার নাকের পাটা ফুলে গেছে
আর একটু হলেই...তুমি এসে কল্পনায় দারুণ উৎপাত শুরু করলে
তোমার কাছে আমি দাসখৎ লিখে দিইনি, যদি একটা দুপুর
মণিদীপার সঙ্গে...তারপর সব মুছে ফেলা যেত
তবু পারিনি, সেদিন তোমায় বলেছিলাম, হিংসুটে আহ্লাদী পেল্লাদি!

তুমিও আমাকে দু-তিনটে চিঠি লিখেছিলে
না, মোট পাঁচটা, ঠিক মনে আছে
কী সম্বোধন করেছ, শুধু নাম, তাই না?
তোমাদের বাড়ির কাজের লোক আর আমার নাম একই
তবু তুমি অন্য নাম দাওনি
সে সব চিঠি রেখে দিইনি অবশ্য, বিয়ের আগে নষ্ট করে ফেলতে হয়েছে
আমি জানি, আমার ছিন্নপত্রগুলিও হাওয়ায় উড়তে উড়তে
কোনো মরুভূমিতে কিংবা লবণ সমুদ্রে ছড়িয়ে গেছে
একেই বলে, সাধনোচিত ধামে প্রস্থান!

সরকারি কাজে বাইরে যাচ্ছি, এয়ারপোর্টে হঠাৎ দেখা
অনেক বছর বাদে, একটুক্ষণের জন্যে, মনে আছে?
কী সব এলেবেলে কথা হল, ইংরিজিতে যাকে বলে স্মল টক
ওদিকে তোমার স্বামী বেচারি অতিরিক্ত লাগেজ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত
তোমরা যাবে মুম্বাই, আমি দিল্লি, আমাদের সময় আলাদা
সময় আলাদা, সময়ের মাঝখানে বিরাট ফাটল, আমরা কেউ কারুর নয়
তোমার একটা ছেলে, বোধহয় তিন চার বছর বয়েস হবে
তোমার উরুর শাড়িতে মুখ ঢেকে মিটি মিটি চোখে দেখছে আমাকে
সরল শৈশব অতি সাংঘাতিক, বয়স্করা দুর্বল হয়ে পড়ে
এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হল, এ আমার সন্তান
হলেও তো হতে পারত
যদি আমি পেরিয়ে আসতে পারতাম একটা মরুভূমি
আমিও অবশ্য অন্য দুটি সন্তানের পিতা, তারা আমার খুবই প্রিয়
তবু ঐ বাচ্চাটা জুল জুল করে তাকাচ্ছে, কী যে মায়া হল
ওর মাথার চুলে আদর করতে গিয়েও সরিয়ে নিলাম হাত

সিকিউরিটিতে ঢোকার আগে আমি মনে মনে কী বললাম জানো?
এই নারীকে আমি মরীচিকা বলতাম এক সময়, তাই না?
ও আসলে আমার মরূদ্যান
কোনো দিন পৌঁছোতে পারিনি, কিংবা চাইনি, কিন্তু ওর অঞ্জলি থেকেই
তো জল পান করে গেছি সেই যৌবনে
শুধু ঐ টুকুই, মনে রেখো, তুমি আমার বুক মুচড়ে দিতে পারোনি
তোমার মূর্তি গড়িয়ে ভালোবাসার নামে ঘোরাফেরা করেছি
শিল্পের আশে পাশে
সব চিঠি, সব সম্বোধন, তোমাকে নয়, সেই মূর্তিকে
ঝুল বারান্দা থেকে আমিই তোমাকে নেমে আসতে দিইনি

ধুলো মাটির রাস্তায়!

সিঁড়িতে কে বসে আছে

সিড়িতে কে বসে আছে মুখ ঢেকে একা?
এত অন্ধকারে এক জীবনের সারাৎসার দেখা।

সিড়িতে কে মুখ ঢেকে একা বসে আছে?
চিনতে পারো নি, যাও চুম্বনের ছলে ওর কাছে।

মুখ ঢেকে একা বসে আছে কে সিঁড়িতে?
সমস্ত হারিয়ে যাওয়া এসেছে ফিরিয়ে কেউ নিতে।

সিড়িতে কে বসে আছে একা ঢেকে মুখ?
ওর কি অতীত ছাড়া নেই কোনো বিশ্বস্ত সম্মুখ!

সিঁড়িতে কে আছে মুখ ঢেকে একা বসে?
যে চুম্বনে শেষ নেই, তাও গেছে বৃন্ত থেকে খসে!

সিড়িতে কে বসে আছে একা মুখ ঢেকে?
দণ্ড পল থেমে আছে, অন্তরীক্ষ দেখছে দূর থেকে!

সীতার অগ্নিপরীক্ষা

রামচন্দ্র ছিলেন নেত্ররোগী, দীপশিখা তাঁর সহ্য হত না
আর কতবার তুমি অগ্নিপরীক্ষায় যাবে, সীতা?
লক্ষ্মণকে একটি চুম্বন দিলে তেমন কিছু পাপ হত কী?

অগ্নি যে সবার সামনে তোমাকে আলিঙ্গনের সুখ ভোগ করে নিল
তা কেউ বুঝল না?
রাম বরাবরই আগুনকে ভয় পান
সীতাকে জীবনসঙ্গিনী করার মতন পৌরুষই ছিল না রামচন্দ্র বেচারির
সীতাকে উদ্ধার করার জন্যও তিনি লঙ্কা অভিযানে যাননি
লোকে কী বলবে, সেই ভয়েই তো তাঁকে অত ঝুঁকি নিতে হল
লোক, লোক, লোক, তারা সবাই হাত না তুললে সিংহাসন
ফিরে পাওয়া যায় না
বীরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধে হারাবার মতন ক্ষমতা ছিল না
রামচন্দ্র আর তাঁর দলবলের
তাই বিশ্বাসঘাতক বিভীষণের সাহায্য নিতে হয়েছিল
সেই শুরু হল ছলে, বলে, কৌশলে, সমস্ত ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে
ক্ষমতা দখলের রাজনীতি
শ্রীরামচন্দ্রই এর প্রবর্তক
যারা রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার কথা বলে তারা সবাই
ওই বিভীষণের বংশধর!
সেই প্রথমবারই যদি তুমি অগ্নিপরীক্ষা অস্বীকার করতে, সীতা?
সগর্বে অসতীত্ব মেনে নিয়ে উড়িয়ে দিতে আত্মসম্মানের জয়ধ্বজ
তা হলে হয়তো লোক, লোক, লোক, অন্ধ লোকশক্তি
আর ফিরতেই দিত না রামকে
অযোধ্যায় রামের নামে মন্দিরও গড়া হত না
এবং সেই মন্দির ভেঙে মসজিদ বানাবার বর্বরোচিত অন্যায়
এবং আবার ভাঙাভাঙির দুঃসময় থেকে মুক্তি পেত কি
এই হতভাগ্য দেশ?

সুন্দরের স্বপ্ন ভাঙে

নদীটি শুকিয়ে গেছে, পড়ে আছে নদীটির নাম
পূর্ণিমার চাঁদ এসে দোল খেতে গিয়ে দেখে
জল নেই, শুনশান, স্থির মধ্যযাম!
ভেঙে যায় সুন্দরের ছোট ছোট।
প্রিয় স্বপ্নগুলি
ইঁদুরেরা খেয়ে নেয় প্রেক্ষাপট, রং মাখা তুলি!

সুন্দরের স্বপ্ন ভাঙে, হারায় না, ফিরে ফিরে আসে
এই বৃষ্টি, এই রোদ যেমন আকাশে।
যেমন শৈশব স্মৃতি, এ সবই তা জেদি
চতুর্দিকে যত হোক কামান গর্জন, তবু
মায়ের গলার স্বর
সব শব্দভেদী!
সুন্দর লুকিয়ে থাকে, খেলা করে একান্ত নিভৃতে
সে জানে কেউ না কেউ ঠিক এসে যাবে তাকে
বুকে তুলে নিতে।
সুন্দরের এক কণা এসে পড়ে এঁদো জলে,
কচুরি পানায়
তাজমহলের চেয়ে সেখানেও তাকে কিছু কম কি মানায়?
শুধু তো গোলাপে নয়
ঝরে পড়া শেফালির, আশ্বিনের কাশে
গরিব ঘরের চালে সে হঠাৎ কুমড়োর ফুল হয়ে হাসে
শালিক পাখিটি উড়ে যায়, কিছু শব্দ রেখে যায়

বাবুই পাখির বাসা সুন্দরের ঘর বাড়ি
এমনকী লেগে থাকে পরিশ্রমী
পিঁপড়েদের পায়
ঘুম যদি নাও আসে, স্বপ্ন ছাড়া বেঁচে থাকা ভার
বারবার ফিরে এসো সেই স্বপ্নে
সুন্দর আমার!

স্বপ্ন

সাত পা এক সঙ্গে হাঁটা, তারপর স্বপ্ন দেখা শুরু
যখন তখন, দিন দুপুরে, রান্না ঘরে, বাথরুমে জলের ধারায়
স্বপ্ন বদলে যায় বারবার
তুমি মেয়ে চেয়েছিলে, আমি কেন ছেলে চাই
নিজেই জানি না
দেখো, যে এসেছে সে যে দু'জনেরই
দু' চোখের মণি
হামাগুড়ি দিতে দিতে টলটলে পায়ে দাঁড়িয়েছে
এখন দুধের গ্লাস নিজে ধরতে পারে, কী দারুণ
চমৎকার দুষ্টুমি শিখেছে।
এবার ইস্কুলে যাবে, মামণি ইস্কুলে যাবে
তুমি কিংবা আমি পৌঁছে দেব, কিন্তু কে আনবে
স্কুলবাস অ্যাদ্দুর আসে না।

আবার সে স্বপ্নটাই ফিরে ফিরে আসে
আমাদের চার দেয়াল, আমাদের নিজস্ব বারান্দা

ঘিঞ্জি বসতিতে নয়, শহরতলিতে নয়
নতুন রাস্তায়
অফিস যাবার পথে রোজ দেখি। সার সার বাড়ি উঠছে
তিনতলার ফ্ল্যাট
পুরোটা দক্ষিণ খোলা, বড় বড় জানলা সব দিকে
দেখো, দেখো, মেঝেটা কী ঠান্ডা, আর দেয়ালগুলোও
বেশ দূরে দূরে
রং বদলাতে হবে, যেমন দেখেছিলাম ভোরবেলা
কাঞ্চনজঙ্ঘায়
মামণি, দেয়ালে তুমি খবরদার পেনসিল দিয়ে
ছবি আঁকবে না
টবে ঝুলবে মানি প্ল্যান্ট, এবং মায়ের ঘরে রামকৃষ্ণদেব
খাঁচার ময়না পাখি, মা ওটা আনবেনই,
যখন তখন কথা বলে
দরজায় বেল বাজলে বলে ওঠে, কে এল গো? এসো, বসো
চা খাও, চা খাও!
কী মুশকিল, ওর জন্য কলের মিস্তিরি আর পিয়নকেও
চা খাওয়াতে হয়।

হাওয়ায় উড়ছে

যে-মুহূর্তে তোমার পায়ে একটা কাঁটা ফুটল
অস্ফুট কাতর শব্দে অবনত হলে তুমি
সেই মুহূর্তে, নারী, তুমি শিল্প হয়ে গেলে
কত ছবিতে, ভাস্কর্যে, বিজ্ঞাপনে তুমি চিরকালীন

তোমার সেই মুহূর্তের ব্যথা, ভয় ও অসহায়তার
কথা কেউ মনেও আনবে না
বাঃ শিল্প হতে গেলে তোমাকে মূল্য দিতে হবে না কিছু?
তুমি চাও বা না চাও, তোমার ঐ ভঙ্গিমাটিকে
শিল্প ছাড়বে না।

পুরুষদের পায়ে কাঁটা ফুটলে তা শিল্প হয় না
কাঁটা বনে যদিও পুরুষরাই বেশি যায়

বিশ্বব্যাপী শিল্পে ভরে আছে নারীদের অভিমান
পুরুষদের অভিমান থাকতে নেই
মজার কথা এই, এসব তো আমার মতন
পুরুষদেরই রটনা
পুরুষরাই নানা যন্ত্রণায় বিদ্ধ করে নারীদের
পায়ের তলায় রাখে, আবার মাথায় বসায়
দেবী নাম দিয়ে...
আমি কি নারীবাদী কবিতা লিখছি নাকি?

হাওয়া উড়ছে দু-জোড়া অশ্রুভরা চোখ ও
একটি আঁচল
হাওয়া উড়ছে হাঁটু ভাঙা সিংহের মতন
অসহায় গজরানি
হাওয়ায় উড়ছে ব্যর্থ প্রেম, অলৌকিক ব্যাকুলতা
হাওয়ায় উড়ছে ভুল বোঝাবুঝি, নারী ও পুরুষদের
কোনোদিন ঠিক সময়ে, ঠিক জায়গায়
মুখোমুখি দেখা না হওয়ার অতৃপ্তি...

হিমালয়কেও দেখা যায় না

কোথাও একটা হুড়মুড়িয়ে সিঁড়ি ভাঙছে ভাঙুক
আকাশে তবু ডেকে যাচ্ছে একটা রাতপাখি।

রাস্তাগুলো রিপুভয়ের জন্য রোজই বদলাচ্ছে দিক
দিকভ্রান্তের নিজস্ব রাস্তাটাই অদৃশ্য!

এবার তবে জলে নামবে, মুছবে পদচিহ্ন?
ভালোবাসার জড়ুলে তবু লেগে থাকবে রক্ত।

পিছন ফিরে তাকাও, ছুটে আসবে হাজার প্রশ্ন
খড়ের গাদায় সুচ খুঁজছে অন্ধ ত্রিকালদর্শী।

প্রশ্নগুলি বীর্য হয়ে যাবে নারীর গর্ভে
একটি হাসির ঝিলিকে সব ক্ষণকালের শিল্প।

যেমন তুমি দাঁড়াও এসে আমার চোখের সামনে
হিমালয়কেও দেখা যায় না, আর তো সবই তুচ্ছ!

হে রাত্রি, পাথর-ভাঙা...

হে রাত্রি, পাথর-ভাঙা, শিকলের ঝনঝনানি আর কতক্ষণ?
পুকুরের ধারে নিচু চাঁদ
পুকুরের ধারে নিচু চাদটাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে
খয়েরি খরগোশ

তালপাতার উড়ন্ত শাম্পানে ভেসে গেল একটি আকুল মূর্ধজা
কান্নাপরী
জানলায় কাচ নেই, কে দাঁড়িয়ে রয়েছে এত একা?

চোখ গেল পাখিটির সঙ্গে চোখ গেল
স্বর্গ উত্থানের সিঁড়ি ভগ্নস্তুপ হয়ে পড়ে আছে
চলে যাবে?
বুক ভরা এত ভালোবাসা, আহা, কতখানি খরচই হল না
আগুন কি ভালোবাসা চেনে?